PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-12, No.-2, Nov 2021

চুকা: এক আদিবাসীর জীবনশৈলী ও তার মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান

ড. মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল [1*]

[1*] অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রঘুনাথপুর ক-লজ, পুরুলিয়া, email: jumrityunjoy2011@gmail.com

চুকা খাড়িয়া, অদ্ভুত এক নাম। নামটা শুনলেই যেন মনে হয় এ ব্যাক্তি কোনো শহুরে মানুষের নাম হতেই পারে না। আপনাদের ভাবনা একেবারেই ঠিক, তবে ঠিকানাটা একটু বলে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি, অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশের প্রত্যন্ত এক অঞ্চল ঘাটবেড়া কেরোয়া, সেখানকার কোনো গ্রাম নয় টিভুগড়া নামে এক জায়গায় বসবাস। জায়গাটা ছিল মাহলিটাঁড় গ্রাম সংলগ্ন। এই খাড়িয়া সম্প্রদায়ের বসবাস বহুদিন ধরে ঐ একই জায়গাতে আমরা দেখতে পায়। ঐরকম একটা ফাঁকা জায়গাতে বসবাস করতেই বোধ হয় তারা বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করত। তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত সহজ সরল, কিন্তু আড়ম্বরপূর্ন। আনন্দের সাথে জীবন অতিবাহিত করাই তাদের পূর্ণতা মনে করত। ইদানিং খুব সামান্য পরিমানে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে লক্ষ্য করা গেলেও সরলতা ও নিজস্ব সংস্কৃতির বাইরে একেবারেই যায়নি। কোনো রকমে মাথা গোঁজার মতো ঘর, ঘর ঠিক নয় কুটির টাইপের বলা যায়। যেখানে আসবাব পত্র বলতে তেমন কিছুই নেই শুধু পথাশ্রয়ীদের যতটুকু থাকে ততটুকুই। এত কিছু শোনার পর জীবনযাপন সম্পর্কে কৌতুহল থাকবে না সেটা হয় না। সে সম্পর্কে বলি- স্বীকার ও ফলমূলাদি সংগ্রহই ছিল তাদের মূল জীবিকা। তবে অনুষ্ঠানবাড়ির খাবার নিমিত্ত থালা বাটি গ্রাম্য ভাষায় পতরি খালা ও ঝাড়ু তৈরীতে ভীষন পটু ছিল বলে সেগুলিও সরবরাহ করত। চিকিৎসাবিষয়ক কোনো খরচ খরচা ছিলনা, নিজস্ব ঔষধিতেই তাঁদের অসুস্থতা কেটে যেতো। খুব বেশী হলে গ্রামীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আর ঐ যে ভাটিতে যা পাওয়া যায় তাতেই সেরে ওঠে।

পরিবারটি আমাদের কাছে এক বিশেষ ধরণের বোধ হয়। এমন এক পরিবারে এক বিখ্যাত মানুষ ছিল এই চুকা। তাঁর স্ত্রীর নাম আমি জানি না তবে সকলের কাছে শুনতাম বুধনীর মা বলেই। অর্থাৎ বুধনী তাঁর মেয়ে। দুজনের প্রগাঢ় প্রেম, কখনো একে অপরকে পৃথকভাবে দেখা যেতো না। ঝগড়া ঝঞ্ঝাটও লেগেই থাকত তবুও দুগ্গাসেই যেন পুরোনো প্রেম আবার ফিরে আসতো। পড়াশুনোর সম্পর্কে কোনো খোজখবর নেই, সেগুলো তাদের মাথার বাইরে। তবে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে এক বিশেষপ্রকারের জ্ঞান যে তাঁদের ছিল তা চুকার কথোপকথনে অনুমিত। আয়ুর্বেদশাস্ত্র কি সে বিষয়ে উত্তর না পাওয়া গেলেও অসাধারণ জটিল রোগের ঔষধি নিমেষের মধ্যে বানিয়ে দিতেন। আগাছা লতাগুল্মের মিশ্রনপ্রয়োগে কত নিঃসন্তানের সন্তান উৎপাদনে সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

চুকা বলতেন 'বাচ্চা না হলে চিরসিটি, ভূত না ছাড়লে চিপাকাঠি আর মন ভালো না থাকলে ভাটি।' অন্ত্যজ শ্রেণির এই মানুষটি প্রকৃতিকে সম্বল করেই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করতেন। যদিও মদ ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় তবে ধূমপানকে অসাস্থ্যকর বলেই মনে করতেন। ভয় বস্তুটা কি তাঁর জানা ছিল না। ঐ যে, হাতে থাকত একটি একটি লোহার দন্ড যার সম্মুখভাগটা ফলার মতো আর একটি ছোট্ট কুঠার, বেশ ধারালো। এগুলি একদিকে আত্মরক্ষার সম্বল অন্যদিকে রুজিরোজগারের ভরসা। যে টাকা উপার্জন হতো তাতে পরের দিনের খরচের হিসেব করে নিতেন। পেট ভরে ভাতে যেটুকু লাগতো বাকিটা মদে। স্বামী স্ত্রীর সংসারে বিশেষ টান পড়তো না। মাঝে মাঝে আবার কচ্ছপ বা দুচার কিলো বড় মাছ পেয়ে গেলে বা বাবু ভায়াদের চিকিৎসাতে খুব

বেশি টাকা পেয়ে গেলে ভাটিতেই রাতটা কেটে যেত। খোলা আকাশের নিচটাই হয়ে যেত স্বর্গীয় সুখের শয্যা। ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করলে সুন্দর একটা হাসি উপহার দিত। ঝাঁকড়া চুলের ডগাগুলো বাদামি হয়ে যাওয়ায় মনে হতো যেন আধুনিক কেশরঙে সজ্জিত তিনি। সাবান শেম্পু না দিয়ে এমনকি স্নানের প্রতি অনিহা রেখেও চুল ছিল মস্তকপূর্ন। যদিও আগোছালো তবে তেলের চিটে বাতাস দুর্বল হয়েই থাকত। সে আগোছালোটা হয়তো তেল দেওয়ার পর চিরুনীর অভাবে হতো। অহিংস এই মানুষটিকে ছোটবেলায় আমরা ভীষণ ভয় পেতাম। চুকা আসছে বললেই ছেলেরা আর বাইরে কেও থাকতো না সে যেন ধরে নিয়ে পালাবে। বাড়ির বড়রাও ছেলেদেরকে ঘরে ফেরানোর জন্য বৈকালে সেই চুকার ভয় দেখাতেন, যে 'চুকা আসছে' এরুপ ডাক দিয়ে। আশ্চর্যের বিষয় চুকার পরলোকগমনের পরেও সে ডাক আমরা বহুদিন পেয়েছি এবং সকলে পালিয়েও গেছে যেন চুকার আত্মা আসছে। কিন্তু চুকার মৃত্যু গ্রামে যে শোকের ছায়া ফেলেছিল তা আমার ঠাকুমার কথা থেকেই বুঝতে পারতাম। ঝাড়ু হাতে নিলেই- 'আহারে! এটা বুধনীর মায়ের ঝাড়ু, এ জিনিস কি আর পাওয়া যাবে? ঐ তো দোকান থেকে কিনে আনে, কদিন টিকে। বলতে বলতেই প্রশংসায় বিভোর হয়ে যেতেন, সঙ্গে সঙ্গে শোকের একটা ছায়া যেন সকলকে গ্রাস করতো।' বুধনীর মা বলতে চুকার স্ত্রী, চুকার যেকোনো কাজের মধ্যেই একটা শিল্প ছিল সুতরাং ঝাড়ু তৈরীতেও যেন সেই শিল্প প্রকট হয়ে উঠত। এমন বাঁধন থাকত যে সে বাঁধন ঝাড়ু ক্ষয়ে না শেষ হওয়া অবধি থাকত।

ভয় নেই পৃথবীতে এরকম ব্যক্তি খুব কম রয়েছে কিন্তু আমার দেখা চুকাদম্পতীর মধ্যে কোনো ভয় ছিলনা। ভয় বিষয়টির প্রকার বলতে গেলে নানারকম Phobia র কথা মাথায় আসে । ইংরেজিতে Irrational fear বা অযৌক্তিক ভয় বলে। দার্শনিকদের ভাবনা অনুযায়ি প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনো Phobia তে আক্রান্ত। হয়তো অজান্তে তাঁরও ছিল কিন্তু সেগুলি প্রচ্ছন্ন। যে মানুষের আলো ও অন্ধকারকে একই মনে হতো তাঁর আবার ভয় কোথা থেকে আসে! টর্চলাইটের কথা বললে তিনি বলতেন ও তো হারিয়ে যায় হাতে থাকে না। আর থাকলেই বা কোমরে গোঁজা, জ্বালানোর প্রয়োজন ছিল না। অমাবস্যার রাত্রে বাড়ি পৌছাতে বার কয়েক হোঁচট খেয়ে পড়তেন। পরের দিন ক্ষতস্থানে ধুলোমাটি লাগানোই ছিল ভরসা। আবার বেশী লেগে গেলে শেকড়-পাতা-গাছ-গাছড়ার কথা মাথায় আসতো।

বড়দের ভয় দেখানোর জন্য আমাদের ছোটোবেলা চুকাকে যেভাবে দেখতাম- প্রথমতঃ সে এক ছেলেধরা ধরণের চোর বা লম্পট দ্বিতীয়তঃ ক্ষ্যাপা অর্থাৎ পাগল তৃতীয়তঃ মাতাল, নেশাগ্রস্ত আবোলতাবোল কথা বলে, চতুর্থতঃ হাতে অস্ত্র থাকার জন্য হিংস্র বা ঘাতক প্রকৃতির। যত বয়স বাড়তে থাকল লোকটার প্রতি ভাবনা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হচ্ছিল। মৃত্যুর অনেকদিন পর এখন, যখন তাঁর সম্পর্কে দু-চার কথা লিখছি তখন দেখতে পাচ্ছি লোকটির চোখদুটি। শিক্ষা নেই তবু যেন কোটর থেকে চোখের তারাগুলি বলে দিচ্ছে তাঁর অসামান্য জ্ঞান, বিশেষ দর্শনের কথা। হিন্দু যে তাঁর ধর্ম তা পরিস্কার নয় অসচ্ছ, মলিন কারণ হিন্দুধর্মের নিত্যক্রিয়াদির প্রতি পরিচিতি বেশ কমই ছিল। তবে নামকরণ বা কিছু সংস্কারের বশে হিন্দুত্বই প্রকট হয়ে ওঠে। তবে, পুজো -আচার- আচরনের তেমন কিছু ছিলনা বলে অনেকসময় ধর্মের বেড়াজালটা ভেঙ্গে যেন বাইরে চলে আসতেন এবং বলতেন মানবধর্মের কথা। তিনি তো আর মহাপুরুষদের বানী পড়েননি বা শোনেননি অতএব তাঁর প্রত্যেকটি কথায় যেন নিজস্ব দর্শন। হিংসা বিষয়টার সাথে তাঁর একেবারেই পরিচিতি নেই, জনসাধারণের অধিকার নদীর জলজ সম্পদ ও বনজসম্পদ যেগুলি আবার বনরক্ষকদের বাধাহীন, সেসব দিয়েই জীবিকা নির্বাহ হত। রাতবিরেতে ঘোরা এই নির্ভীক মানুষটির চৌর্যবৃত্তি বিষয়ে জনগণের সন্দেহই ছিল না। সময়ে অসময়ে মদ্যপান করতেন কিন্তু লোকালয়ে এলেও বাকসংযম অবাক করে দেওয়ার মতো। যার সাথে যেমন সম্পর্কের তাঁর সাথে তেমনই কথা বলতেন। জীবন মানে তাঁর কাছে আমোদপ্রমোদে বেঁচে থাকা সেখানে বহুসঙ্গ থাকতে হবে এমনটা নয় একলা পথিক চুকাকে অনেকে হেঁসে হেঁসে যেতে দেখেছেন। ভাবতে পারে অনেকেই পাগল কিন্তু সে তো পাগল নয়, আনন্দপাগল। নৃত্য, গীত কোনো কিছুরই তাঁর মধ্যে স্থান নেই কিন্তু

কি করে এরূপ আনন্দে থাকা যায় ভাবার বিষয়। তত্ব ও তথ্য সম্পর্কে উদাসীন এব্যক্তি সভ্যসমাজে থাকা কোনো নিসন্তানের সন্তান উৎপাদনে জড়িবুটি প্রয়োগ করতেন। আশ্চর্যের বিষয় তাঁর তো কোনো ঠিকানা নেই রোগির বাড়িতে ঔষধ দিয়ে দুই -এক বোতলের দাম নিতেন। তন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কেও খানিকটা অবগত ছিলেন এও আমরা শুনেছি। তবে এই সমস্ত কিছুর সাথে নিঃস্বার্থ বিষয়টি জড়িত ছিল। চুকার দর্শনে স্বাদবর্ধক বলে কোনো খাদ্যের কথা শুনতে পাইনি। প্রত্যেকের মনে হয় এটি খাব সেইটি খাব ওটা ভালো লাগে সেটা ভালো লাগেনা এমন ব্যাপার। কিন্তু চুকার কথায় পেট যেন ভরে। আমার ঠাকুমা একবার চন্দ্রকান্তি অর্থাৎ সরু চাল, দামি চাল দিলে সে চাল যেন তাঁর কাছে পস্তুর মতো মনে হয় অতি শীঘ্রই হজম হয়ে যাবে তাই কমদামি মোটা চালই তাঁর পছন্দ। কামনা বাসনা হীন অদ্ভুত এই মানুষটি অর্থাভাবে কারোর বাড়িতেও কাজ করতে যেতেন না। তবে অনুষ্ঠান বাড়িতে পাতার থালাবাটি সরবরাহ যেন তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এমনটাই মনে করতেন। সেই সাথে ভোজনের পর থালা বাটি তোলা ও আনন্দের সাথে উচ্ছিষ্ট নিয়ে বাসায় ফেরা। সেইসাথে মদ্যপান তো রোজকার ব্যাপার ছিল। খেড়িয়া/ শবর সম্প্রদায় নিয়ে অনেক লেখা রয়েছে, তাঁদের প্রকৃতিই যদিও এইরকম কিন্তু চুকার বিষয়টি একটু অন্যরকম বলেই এতকথা লিখতে হচ্ছে। সন্ধ্যের পর কোনো বাচ্চা বাড়ির বাইরে থাকলে- 'এই বাড়ি যা নাহলে ধরে নিয়ে যাবো' ভয় দেখিয়ে বাড়িতে ঢুকিয়ে দেওয়াও তাঁর কাজ ছিল।

সবথেকে কমদামে কেও যদি মাছ দিতেন তাহলে এই চুকা। শুধু কি তাই গ্রামের লোকজন তাঁর দেড় কিলোকে এক কিলো বলে চালিয়ে দিতেন এমনও দেখা যেতো। মধু-র বিষয়েও একই ব্যপার খাঁটি মধুও অতি কমদামে গ্রামে সরবরাহ করতো। এছাড়া কিছু বিশেষপ্রকার আলুর সরবরাহ করতেন যেগুলি লোকালয়ে পাওয়া যেত না বনেই নাকি সেগুলো পাওয়া যায়। যেগুলির নামই ছিল খাড়িয়া আলু। সুস্বাদু এই আলু এখনো যেন মুখে লেগে আছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের ছাতুও বিক্রি করতেন কখনো বা কচ্ছপ বনমুরগি এইসকল। এই সমস্ত তাঁর কাছে যেন অর্থের তাগিদে আর অর্থও যেন মদের প্রয়োজনে। খাদ্য পোশাক- পরিচ্ছদ বা অন্য সব কামনা বাসনাতে সর্বদা তো পরিতৃপ্তই থাকতেন। সুতরাং এগুলির আর প্রয়োজন কি? উদরপুর্তির পর অবশিষ্ট আয় মদেই ব্যয় হতো। টলতে টলতে গ্রামে এলেও তাঁর কথার কোনো অসঙ্গতি থাকত না। দাদা, কাকা, পিসি, মাসি যার যেটা সম্পর্ক তাঁর কোনো ব্যতিক্রম হতো না। স্পঞ্জের উপরে হাঁটলে যেমন ভাব আসে খালি পায়ে হাঁটা তাঁর তেমনই মনে হতো। যানবাহনের কোনো বালাই ছিলনা। হয়তো খুব প্রয়োজন মনেই হতো না। তাঁর দর্শনে জীবনকে হাঁটতে চলতে সব জায়গাতে উপভোগ কর। বিশ্রামের জন্য আলাদা কোনো স্থানের প্রয়োজন নেই তাই পথ চলতে গিয়ে ক্লান্ত হলে বৃক্ষের ছায়ার তৃনও সুখশয্যা হয়ে যেত। রাতে ঘুমানোও অস্বাভাবিক ছিল না। এসব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর আসতো -'আমার কিছু হবে না আমাকে কিসে ছোঁবে আমাকে বাঁচানোর লোক আছে।' সত্যি এখন আমার মনে হয় এরাই ছিল প্রকৃতির সাথে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে। মা প্রকৃতি যেন কোলে আগলে রেখেছেন। কীট-পতঙ্গ, হিংস্র জীব-জন্তু থেকে রক্ষারও দায়-দায়িত্ব তাঁরই। গভীর সমুদ্ররূপ পৃথিবীতে যেন এরূপ ব্যাক্তিদের বসবাস তাহলে সে বুঝবে কিকরে পাড়ের ঢেউ এর কি যন্ত্রণা। সমতল বিচরণ, বুঝতে পারেনা এরা- পাড়ের দিকে যাচ্ছি, না আরো গভীরে যাচ্ছি।

হঠাৎ একদিন শোনা যায় চুকা আর নেই। এলাকার অতি পরিচিত একজন ব্যাক্তির মৃত্যুতে শোকের ছায়া পরিস্কার দেখা যায়। তাঁর ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি তেমনভাবে কাওকেই শোকগ্রস্ত দেখা যায়নি। বুধনী যদিও গল্পের ছলে খানিকটা অশ্রুপাত করছিলেন। তবে প্রকৃতি অবশ্যই ডুকরে কেঁদেছিল। আমারা তা লক্ষ্য করতে পারিনি, সেদিন বৃষ্টি নেমেছিল, তাঁর প্রকৃত সন্তানকে সে সঠিক শিক্ষা দিতে পারেনি তাই। মদ যে বড় মন্দ জিনিস তাঁকে কোনোদিন বোঝাতে পারেনি। সচেতন এলাকাবাসি মদ্যপ চুকাকে নিয়ে মজা করতেন, কোনোদিন মদমন্দ বোঝায়নি। মাতাল তো, তাই একবোতল মদে সারারাত পরিশ্রম করে ধরা দুইকিলো মাছ অনায়াসে নিয়ে সানন্দে ভক্ষণ করতে পারতেন। মানবিকতা বড় সহজেই বোঝানো যায় কিন্তু প্রয়োগ যে কি কঠিন তা সমৃদ্ধ মোড়লরা সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

এখন যদিও তাঁর উত্তরাধিকারেরা অনেকটা উন্নত হয়েছে। সরকার চেষ্টা করে চলেছে তাদের সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসার জন্য তবে সফলতার পরিমাণ অতি স্বল্প বলেই বোধ হয়েছে। তবে মানুষজনেরা অতি কষ্টে যখন বলে 'আর এরা আগের মতো নয় চালাক চতুর হয়েছে' শুনে আমার খুব আনন্দ লাগে।

তবে স্বার্থপরের মতো কখনো কখনো আমারও মনে হয়েছে চুকার কালে আমি যদি এখনকার মতো তাঁকে জানতাম বুঝতাম তাহলে আমি তাঁর একজন অস্থায়ি শিষ্য হতাম। তাঁর যে দর্শন, তাঁর যে গুণ, তাঁর যে নিজস্ব বিদ্যা ছিল সেগুলির কিছুটা হলেও সংরক্ষণের চেষ্টা করতাম। দুঃখের বিষয়, সেগুলি কেও রাখতে পারেনি কারণ তাঁর পরবর্তিদের মধ্যে সে উৎসাহ ছিলই না। আর গ্রাম্য লোকজন? সে তো চরম অনিহা, অস্পৃশ্যের কাছে শিক্ষা- এটা তো বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। হারিয়ে গেল কত কিছু আমরা কিছু বুঝলামই না। তাঁর তো কোন লেখা নেই আর তিনি তো কোন লেখাপড়া জানতেনও না লিখবেন কি করে। বৈদিক যুগের মতো পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে হয়তো শোনা আর স্মৃতিতে রেখে দেওয়া এছাড়া আর তো কিছু নেই। হয়তো থাকলে সেগুলো হতে পারতো অনেক কিছু কিন্তু কিছু আর করার নেই, সেখানেই সব ইতি হয়ে গেল। চুকাও শেষ আর চুকার অমূল্য সম্পদও শেষ।

তথ্যসংগ্রহ :

১। বুধনী শবর (চুকার মেয়ে)
২। বুধু শবর
৩। মহেন্দ্রনাথ মন্ডল